কা । না । ডা

কানাডায় চাকরির বাজার ভালো নয়

বাংলাদেশের যত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হোক আর যত বড় ডিগ্রিই থাকুক না কেন কানাডায় তাদের জন্য কোনো চাকরি নেই। বাংলাদেশের ইমিগ্র্যান্ট কনসালটেন্সিগুলো সেমিনার করে অনেক স্বপ্ন দেখায় ক্লায়েন্ট ধরার জন্য কিন্তু একবারও আসল বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে না। তাহলে তাদের প্রায় বিনা শ্রমে লাখ লাখ টাকা ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে। কানাডায় আসার আগে ভেবেচিন্তে আসতে হবে...

জসিম মল্লিক, অটোয়া থেকে

এখন অবশ্য কানাডা সরকারের নতুন বিধানে ইমিগ্রেশন প্রার্থীরা সিএসআইসির অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই কনসালট্যান্ট বা আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন। অতএব আবেদন করার আগে কনসালটেন্সি এজেন্সিগুলোর সিএসআইসির অনুমোদিত সার্টিফিকেট আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। না হলে আপনার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে। যাই হোক। কানাডার শিক্ষার মান পৃথিবীর সেরা। এমনকি ক্যামব্রিজ বা অক্সফোর্ডের পিএইচডিধারীরা ও এ দেশে এসে কাজ না পেয়ে সেলসম্যান বা সিকিউরিটির কাজ করছেন। ছোটখাটো একটি ভালো কাজ পেতে হলে এখানকার ডিগ্রি অবশ্যই লাগবে। অনেক বাংলাদেশী ফেডারেল গভর্ণমেন্ট বা ইউএন অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন। তারা অবশ্যই এখানকার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন। এখানকার সরকারি চাকরি অনেকটা বাংলাদেশের মতোই। বেশ আরাম-আয়েশ এবং অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা। তবে পার্থক্য এটুকুই, আমাদের দেশের সরকারি চাকুরে অনেকেই কাজ ফাঁকি দেয় এবং চুরি করে। এখানে চুরির কোনো সুযোগ নেই। নতুন যারা আসবেন তাদের জন্য চাকরির বাজার ভয়াবহ। প্রথম এক বছর আপনার এখানকার পরিস্থিতি বুঝতেই চলে যাবে। যারাই আসবেন তারা অন্তত ছয় মাসের চলার মতো টাকা নিয়ে আসবেন। এই ছয় মাসে কোনো একটা শর্ট কোর্স করে নিয়ে তারপর কাজের চেষ্টা করুন। এখানকার সব ধরনের কোর্সেরই গুরুত্ব আছে এবং চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিনে পয়সায় ইমিগ্র্যান্টদের কোর্স করিয়ে থাকে।

যারা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসবেন তারা অন্তত কিছু টেকনিক্যাল কাজ শিখে আসুন। এমনকি ঘড়ি মেরামতেরও অনেক চাহিদা এখানে। না হয় অটো মোবাইল, রেফ্রিজারেটর বা এয়ারকন্ডিশনিং শিখে আসুন। ইন্টেরিয়র, জুয়েলারি বা হেয়ার স্টাইলিং, এসবেরও অনেক কদর। উল্লিখিত সবগুলো কোর্সই এখানে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখতে হয়। প্রতিটি কোর্সের সময়কাল ১ মাস থেকে ১ বছর। সব পড়াশুনার জন্যই আপনি লোন পাবেন।

বাংলাদেশীরা কানাডার মূল ওয়ার্কফোর্সে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা খুবই সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সিলেটিরা এখানে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ভালো করছে। সব রেস্টুরেন্টের নামই ইন্ডিয়ান নামে। এর কারণ হয়তো বাংলাদেশ নামটার সঙ্গে অবিশ্বাস যুক্ত আছে। যেমন- লাইট অব ইন্ডিয়া, স্টার অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া প্যালেস, সীতার, মনিমহল- এসবই বাংলাদেশীদের রেস্টুরেন্ট। এসব রেস্টুরেন্ট অনেকটা পারিবারিক। পরিবারের লোকজন মিলে এগুলো পরিচালনা করে। বাইরের লোকদের এখানে চাকরির সুযোগ নেই বললেই চলে। যেহেতু এসব রেস্টুরেন্টে পেমেন্ট দেয়া হয় ক্যাশে, তাই আওয়ার খুব কম। ক্যাশে কাজ করে সোস্যালি ইসিস্টেন্স নিতে অসুবিধা নেই। কোনো রেকর্ড থাকে না।

কানাডায় বড় শপিং সেন্টার হচ্ছে ওয়াল মার্ট। সিয়ার্স বে জেলার্স, কস্টকো, জায়েন্ট টাইগার ইত্যাদি। কানাডিয়ান গ্রোসারিগুলো হচ্ছে ইনডিপেনডেন্ট, ফুড বেসিক, ফার্ম বয়, ফ্রেশ মার্কেট, সুইট কোস্ট ইত্যাদি। ফাস্টফুডগুলো হচ্ছে টিম ইরটন (মূলত কফি শপ), ম্যাকডোনালস, পিজা হাট, পিজা পিজা,

দ: । কো । রি । য়া

বেকার হচ্ছে শ্রমিকরা

এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম উন্নত দেশ দক্ষিণ কোরিয়া। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের শ্রমের ফসল আজকের এই কোরিয়া। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ জাপানের পরেই কোরিয়ার অবস্থান উন্নত দেশ হিসেবে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে কি তা মনে হয়? চারদিকে হাহাকার, কোথাও কাজ-কর্ম নেই, বড় বড় অনেক কল-কারখানা দেউলিয়া হওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কেন যে এমন পরিস্থিতি হলো সরকারও বোধহয় জানে না। হাজার হাজার দেশী/বিদেশী শ্রমিক বেকার বসে আছে। বাংলাদেশীও অনেক ভাই বেকার আছে। দেশের বেকারত্ব ঘোচাতে এই প্রবাসে এসেও বেকার! ভাবতেও অবাক লাগে। রাস্তায় কোনো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে- 'ভাই কোনো কাজের সন্ধান আছে নাকি।' এদের মধ্যে বেশির ভাগই পুরনো এবং নতুন অর্থাৎ বেশির ভাগেরই ভিসা নেই। অবশ্য ভিসা থাকার পরও অনেক বেকার আছে। অথচ কয়েক মাস আগেও তাদের কাজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কাজও নেই, তাদের কদরও নেই। এমনও হয়েছে যে, দুই-তিন মাস কাজ করার পর আর মালিকের খোঁজ-খবর থাকে না। তাদের বেতন তো দূরের কথা, ফোন পর্যন্ত রিসিভ করে না। তবুও অনেকে অপেক্ষায় থাকে মালিক আসবে, বেতন দিবে। কিন্তু সবই গুড়ে বালি। শুনেছি এ পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক এসেছে কাজের উদ্দেশ্যে। আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের এ পরিস্থিতির কথা দেশের কেউ কি জানে না? তাহলে কেন এতো টাকা খরচ করে আসছে? তাদের টাকা-পয়সার প্রতি কি কোনো মায়া নেই? এক মিনিটেরও ভরসা নেই। যে কোনো মুহূর্তে ধরে পাঠিয়ে দিতে পারে জেনেও কেন যে আসছে আমার মাথায় ঢোকে না। বর্তমানে কোনো প্রবাসীই বোধহয় স্বস্তিতে নেই। কি হয় কি হয় এই শঙ্কায় সবাই অস্থির। জানি না যাদের ভিসা আছে তাদের ভাগ্যেই বা কি আছে।

এভাবেই তো কেটে যাচ্ছে আমাদের জীবন।

Saiful Islam Babu, Dae-sung Corporation, 404-280, 198, Dae. Goke Dong SEo.Gu, Inchon, S.korea

কেএফসি, সাবওয়ে ইত্যাদি। এগুলোতেই অনেক বাংলাদেশী কাজ করে। তবে এসবের জন্যও পূর্ব অভিজ্ঞতা দরকার হয়। এমনকি ক্লিনার গ্যাস এটেনড্যান্ট-এসবের জন্যও অভিজ্ঞতা দরকার। শুধু তাই নয়, গাড়ি থাকাও কাজের পূর্বশর্ত। সিকিউরিটির চাকরি এখন বেশ প্রসার লাভ করছে।

১১ সেপ্টেম্বরের পর এ পেশায় অনেক এজেন্সি লোক নিয়োগ করছে। হোম ডে-কেয়ার বা হোম সাপোর্ট এসবও এখানে খুব গুরুত্যপূর্ণ পেশা। এজন্য ১-২ বছরের কোর্স করতে হয়। সার্টিফিকেট ছাড়া কোথাও আপনি কাজ পাবেন না। ট্যাক্সি ড্রাইভিং খুব কঠিন কাজ। এর লাইসেন্স পেতে হলে অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হবে। রেস্টুরেন্ট ছাড়াও অনেক বাংলাদেশী বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন। তারা কেউ কেউ সফলও হয়েছেন। এর মধ্যে গ্রোসারি ব্যবসা একটি। বাঙালিদের জন্যই মূলত এই গ্রোসারি। বাংলাদেশে বসে আপনি যা না পাবেন তার সবই এখানে পাওয়া যাবে। গ্রোসারি ছাড়াও বাংলাদেশী কেউ কেউ চেইন ব্যবসা অর্থাৎ ফ্রেনচাই ব্যবসায় সফল হয়েছেন। এর মধ্যে সাবওয়ে, টিম ইরটন, ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, কফি টাইম এসব রয়েছে। কেউ কেউ জুয়েলারি বা কাপড়ের ব্যবসাও করছেন এখানে। অটোয়ার বিখ্যাত কলেজটির নাম এলগনকুইন কলেজ (Algonquin College)। এই কলেজে অসংখ্য শর্ট কোর্স করার ব্যবস্থা আছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কোর্সের নাম উল্লেখ করা হলো ডেন্টাল ট্রেইনিং, চাইল্ড কেয়ার, কমিউনিটি এন্ড সোস্যাল সার্ভিসেস বারটেন্ডিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ট্যুরিজম এন্ড ট্রাভেল, ট্যাক্সি ড্রাইভিং ট্রেনিং, ফ্যাশন ড্যান্স, ড্রামা, ক্রিয়েটিভ আর্টস, গ্রাফিকস, পাবলিক রিলেশন মিডিয়া কমিউনিকেশন। কুকিং, মিউজিক এন্ড অডিও প্রভৃতি কোর্স রয়েছে। এলগণকুইন কলেজের ঠিকানা হচ্ছে-

Algonquin College, Continiuing Education, 1385 woodroffe Ave Ottawa, On K2g 1V8, Tel : (613) 727-9797, Toll Free : 1-888-305-3880. Fax : (613) 727-7754. www . algonquincollege.com. এসব কোর্স থেকে বাছাই করে একটি-দুটি কোর্স করে নিতে পারলে চাকরি পেতে সুবিধা হয়। এসব কোর্স ৩-৬ মাসের এবং খরচ ৩০০-১০০০ ডলারের মধ্যে।

মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ থেকেও অনেক বাংলাদেশী এখানে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসছেন। তারা হয়তো সেখানে ভালো কাজ করতেন। তারপরও তারা সোনার হরিণের আশায় কানাডা ছুটে আসছেন। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ বা অন্যান্য প্রান্ত থেকে এখানে ছুটে আসার প্রধান কারণ হচ্ছে ইমিগ্র্যান্টরা ৩ বছর পর সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন। অন্যান্য দেশে সামাজিক মর্যাদা বা স্ট্যাটাস নেই বললেই চলে। তারাও এখানে এসে কাজ না পেয়ে হতাশায় ভোগেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পিএইচডিধারী অনেকেই ট্যাক্সি ড্রাইভিং করছেন বা সিকিউরিটির চাকরি করছেন। কানাডায় চাকরি করতে হলে বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশের ডিগ্রির তেমন মূল্য নেই। এখানকার ডিগ্রি সারা বিশ্বে রিকতানাইজ।

ভাষাগত সমস্যা: কানাডায় চাকরি না পাওয়ার আর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ভাষা। কানাডার প্রধান ভাষা হচ্ছে ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ। কানাডা মালটি কালচারের দেশ। বলা হয়ে থাকে, এখানে পৃথিবীর প্রায় ১৩৫টি দেশের লোক বসবাস করে থাকে। এক সময় সারা পৃথিবী ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চরা শাসন করেছে। ফরাসি বা ব্রিটিশরা যেসব দেশ শাসন করেছে তাদের ভাষার আধিপত্য বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কুইবেক অঞ্চল অর্থাৎ মন্ট্রিয়েলসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফ্রেঞ্চ ভাষার আধিপত্য বেশি। ফ্রেঞ্চ না জানলে এসব জায়গায় কাজ পাওয়াই কঠিন। কুইবেক অঞ্চলে স্কুলগুলোতে টাকার বিনিময়ে ইংরেজি শিখতে হয়। আবার অন্টারিও প্রভিন্সে ইংরেজির আধিপত্য বেশি। এখানে স্কুলগুলোতে বিনে পয়সায় ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখানো হয়। আপনি যতই ভালো ইংরেজি জানা লোক হোন না কেন, এখানকার ইংরেজির স্টাইল, উচ্চারণ সব আলাদা। তবে আমেরিকান ইংরেজি আর কানাডার ইংরেজি প্রায় একই। এখানকার ইংরেজি অনেক বেশি পরিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট। অনেক কমিউনিটি স্কুলে বিনে পয়সায় ইএসএল ESL ক্লাস কম্পিউটারসহ অন্যান্য কোর্স করিয়ে থাকে। ১৪/১৫ বছর এ দেশে থাকার পরও অনেকেই ESL ক্লাসে যায় ইংরেজি শেখার জন্য। আবার যারা সোশ্যাল এসিস্ট্যান্স নেয় তাদের স্কুলে যাওয়াটা অনেকটা বাধ্যতামূলক। অতএব নতুন ইমিগ্র্যান্টদের এখানে এসে ইংরেজিটা ভালোমতো শিখে নিলে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধাই হবে। না হলে পদে পদে বিপদ।

বে ল জি য়া ম

ফিরতে পারবো স্বদেশ

প্রবাসের দীর্ঘ জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের বিনিময়ে বর্তমানে বেলজিয়ামের Poort city Antwerren-এ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে স্বাধীনভাবে জীবিকা লাভের সুযোগ হয়েছে। ব্যবসায়িক কারণে এ সমাজের সবশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়তই মতবিনিময় হচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে, এই সমাজের মানুষকে কাছ থেকে জানা, এদের স্বভাব, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার পদ্ধতি, চাওয়া-পাওয়া সব কিছুই অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশীদের টাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, এদেরই টাকার প্রয়োজন আমাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। মূল কারণ হচ্ছে, প্রতিটি লোকই এই সমাজে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্সের হাতে বন্দি। মাসিক আয়ের ৭০% টাকাই চলে যায় বাড়ি এবং গাড়ির খাতে। যুবক-যুবতীদের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে Life Partner Selection. এটা একটা জীবন-মরণ লড়াই। এই লড়াইয়ে যে হেরে যাবে, তার হয়তো আজীবন একাকী জীবন কাটাতে হবে! লড়াই করতে গিয়ে অনেককে হয়তোবা Final Satelment-এর পূর্ব পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ বারেরও বেশি Partner Change করতে হয়। এ ব্যাপারে বাবা-মা'র কোনো ধরনের নাক গলানোর Tradition এ দেশে নেই। আঠারো বছরের পর থেকে ছেলে-মেয়েদের প্রায় বাধ্যতামূলক আলাদা থাকতে হবে। আর যদি কেউ বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতে চায় তবে মিনিমাম কিছু হলেও সংসারে খরচের অবদান থাকতে হবে। ব্যক্তিগত হাওলাদ পিতা-মাতা থেকে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, হাওলাদ দেবার জন্য ব্যাংক সব সময়ই রাজি। তবে এজন্য স্থায়ী কাজের প্রয়োজন। এমনও ছেলে-মেয়ে আছে যারা দীর্ঘ সাত বছর একত্রে থেকেও এক সন্ধ্যায় একে অপরকে আর ভালো লাগে না এ কথা জানিয়ে সম্পর্ক শেষ করে ফেলে। এমনকি ঐ সন্ধ্যায়ই অন্য ছেলে-মেয়ের হাত ধরে হাসি মুখে নতুনত্বের সন্ধানে রওনা হয়। এই ছাড়াছাড়ির খেলায় এ সমাজের লোক কোনো লজ্জাবোধ করে না। এ সমাজ থেকে বিবাহ-বন্ধন প্রতিনিয়তই শিথিল হয়ে যাচ্ছে। জীবন ভোগ করার নেশায় এ সমাজের মানুষগুলো বাবা-মা হওয়াটাকে নিজেদের সুখ-শান্তির অন্তরায় ভাবছে। এভাবে জন্মের হার মৃত্যুর হারের চেয়ে কমে যাচ্ছে। তাছাড়া সমকামীদের বিবাহের Permission হওয়ার পর থেকে এ সমাজে এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সমকামীদের আলাদাভাবে Disco, Bar রয়েছে। সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার এ দেশে এখন সরকার স্বীকৃত। সবদিক মিলিয়ে দিন দিন এ সভ্য সমাজের এই অন্ধকার দিকগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমার দুটি মেয়ে এ দেশের স্কুলে লেখাপড়া করে এদের সমাজ ব্যবস্থায় বড় হচ্ছে। বাংলাদেশী পিতা হিসেবে আপ্রাণ চেষ্টা করছি এ সমাজের অন্ধকার দিকগুলো থেকে সন্তান দুটোকে বাঁচিয়ে বড় করতে। জানি না কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারবো। পরিশেষে বলবো, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' তবে একটা কথা, তুমি যদি কাগজে কলমে সোনার বাংলা না হয়ে বাস্তবে হতে, তাহলে সভ্যতার নামে এই সমাজের এই বর্বরতাগুলোকে লাথি মেরে চলে আসতাম তোমার বুকে। হে আমার দেশের রাজনৈতিক কর্ণধার, আপনাদের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ, দলমত-নির্বিশেষে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, একত্রে দেশটাকে গড়ে তুলুন। আমাদের মতো আজীবন প্রবাসীদের মাতৃভূমিতে ফিরে এসে বাকি জীবন বাবা-মা, ভাই-বোন, সবার সঙ্গে কাটাবার সুযোগ করে দিন।

Golam Kabir-Selina Begum, Dambruggestraat 22-2060 Antwerpen, Tel : 03-226 6470 - 0497 81 8931

ল । ন্ড । ন

তৃতীয় বাংলার বৈশাখী মেলা

গোমড়া আকাশ, ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আর হঠাৎ ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, কোনো কিছুই কমাতে পারেনি উৎসাহী বাঙালির ঢল। সেদিন ছিলো ৯ মে রোববার। প্রতিবারের মতো এবারও আয়োজন করা হয়েছে লন্ডনে বাঙালির প্রাণের মেলা, বৈশাখী মেলা।

হোয়াইটচ্যাপেল রোডের পাশে শহীদ আলতাফ আলী পার্ক, যেখানে রয়েছে বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের জ্বলজ্বলে স্মৃতিচিহ্ন, আমাদের শহীদ মিনার। তার উল্টোদিকে অসবোর্ন স্ট্রিট হয়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাসখ্যাত

ছিল দেশী খাওয়ার আয়োজন

দেশ থেকে জিনিস এসেছে, ভিড় বাড়ছে

ব্রিকলেন, গোটা ব্রিকলেন জুড়ে বসেছে ইউরোপে বাঙালির সবচেয়ে বড় মেলা, বৈশাখী মেলা। ব্রিকলেনের পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন অ্যালেন গার্ডেন্স, সেখানে রয়েছে বিশাল মঞ্চ আর ফান-ফেয়ার।

প্রত্যেকটা স্টল বাংলাদেশের যেকোনো মেলার মতোই, ব্যতিক্রম হচ্ছে সবাই পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সদা সজাগ। দেশীয় মেলায় যেমন খেলনা, বাঁশি, মাটির তৈরি ছোটখাটো খেলনা, শো-পিস, বাঁশ বা বেতের তৈরি জিনিসপত্র থাকে, সঙ্গত কারণে এখানে এগুলো অনুপস্থিত। তার বদলে রয়েছে অডিও-ভিডিও স্টল। সেখানে বিক্রি হচ্ছে হালের জনপ্রিয় শিল্পীদের অডিও ক্যাসেট আর ভিসিডি। বাংলা আর হিন্দি ছবির ভিসিডি-ডিভিডি। প্রচুর বাংলা ছবি, নাটক, টেলিফিল্ম, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির ভিসিডি-ডিভিডি বা ভি.এইচ.এস ক্যাসেট। বাংলাদেশী টিভি চ্যানেলগুলোর যেকোনো নাটক বা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের চাহিদা লন্ডনে আকাশছোঁয়া। বাংলাদেশের মতো এখানেও খাবার স্টলের আধিক্য। যেমন চা দোকান, পোলাও-বিরিয়ানি বা বিভিন্ন কারী, পিঠাপুলি, ফুচকা-চটপটি, তাজা ফল আর জুস, সব ধরনের মিষ্টি, কচি ডাব আর আখ। রয়েছে শাড়ি-চুড়ি-জামা, কানের দুল, নাকের ফুল কিংবা লেইস ফিতা, রকমারি খেলনার স্টল। আছে বিভিন্ন সাইজের বাংলাদেশী পতাকা, বেলুনওয়ালা, আইসক্রিমওয়ালা, ফটোফ্রেম, কক্সবাজারের ঝিনুকের তৈরি পণ্য, কি নেই?

সকাল থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মেলায় দর্শনার্থীদের আসা শুরু। শুধু লন্ডন বা তার আশপাশ থেকে নয়, কোচ ভাড়া করে মেলায় অংশ নিতে এসেছেন সুদূর স্কটল্যান্ড,

শাড়ি বাছাই শাড়ির স্টলে

লিভারপুল, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ব্র্যাডফোর্ড, লিডস, ওয়েল্সসহ অন্যান্য শহর থকে। আয়ারল্যান্ড বা প্যারিস থেকেও আসেন বাঙালিরা। বেলা ৩টার মধ্যে গোটা ব্রিকলেন, অ্যালন পার্ক ও তার আশপাশের এলাকা লাখো বাঙালির কলতানে মুখরিত হয়ে উঠলো। যেন বাংলাদেশের মানুষের ঢল নেমেছে। তৃতীয় বাংলার সবচেয়ে বড় মেলা। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মহামিলন। সারা বছরে একটাই সুযোগ, গোটা দিন একান্ত দেশীয় পরিবেশে কাটানো। আপনজন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে উৎসবমুখর পরিবেশে দেখা করা। পুরোপুরি দেশী পোশাক গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়ানো। পরিবার, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কেনাকাটা, কিছু অন্যরকম খাওয়া- এমন সুযোগ বছরে আর কি আসে? একেবারে হিম না হলেও ভেজা আবহাওয়ার কারণে ঠান্ডা কম নয়। তারপরও সবাই দেশীয় পোশাক পরেছে। পুরুষদের কেউ কেউ পাজামা-পাঞ্জাবি আর কোলাপুরি চটি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তরুণীরা সালোয়ার-কামিজ-ওড়না, নয়তো শাড়ি তার ওপর বাহারি শাল। কারো গায়ে বোরকা, মাথায় অ্যাপ্রন। তরুণেরা মাথায় বাংলাদেশের পতাকার পট্টি বেঁধে ভিড় ঠেলে দলে দলে এমাথা-ওমাথা হাঁটছে আর একটানা বাঁশি-ভেঁপু বাজিয়ে চলছে। আবার হঠাৎ হঠাৎ একযোগে চিৎকার করে বলছে ‘বাংলাদেশ’, যেন মিছিলের স্লোগান। ওরা

সবাই প্রবাসী বাঙালি পরিবারের সন্তান। বয়স ১২ থেকে ১৬-র মধ্যে। কে বলবে এটা লন্ডন? মনে হবে দেশের কোনো মেলা।

চটপটি-ফুচকা আর তেলেভাজার স্টলে ভিড় উপচে পড়ছে। আপামণি আর ভাবীরা প্রাণপণে ফুচকা রেডি করতে করতে এই ঠান্ডায়ও ঘামছেন। অন্যদিকে দেশীয় পিঠার স্টল সামলাতেও আন্টি ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা একযোগে হাত লাগিয়ে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাচ্ছে। কচি ডাবের পানি খাবেন? শুধু ডাব নয়, ডাবের পানি খাবার পর ওটাকে দু'টুকরো করে ভেতরের শাঁস খাচ্ছেন অনেকে। অবরোর্ন স্ট্রিটের শেষ আর ব্রিকলেনের শুরু যেখানে, সেখানে আখ বিক্রি করছেন এক

ভদ্রলোক। আখের রস নয়, পুরোদস্তর লাঠি। পাবলিক দাঁত দিয়ে ছিলে, কামড়ে কামড়ে আখ খাচ্ছে। বিরিয়ানি, চিকেন টিক্কা ছাড়াও আছে সাদা ভাত, ডাল আর সবজি। কেউ কেউ সামান্য ভর্তাটর্তা রেখেছিলেন, নিঃশেষ হয়ে গেছে এক ঘন্টারও কম সময়ে।

অ্যালেন পার্কের ফান-ফেয়ারে লোকে লোকারণ্য, বিভিন্ন আইটেম এনজয় করার জন্যে পরিবারগুলো তাদের শিশুসহ দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষমাণ। একদিকে বড় স্ক্রিনে স্থানীয় টিভি চ্যানেলের বিজ্ঞাপন চলছে অনবরত। পার্কের দক্ষিণ দিকের বড় মঞ্চ সামলাতে ব্যস্ত কর্তৃপক্ষ। ভিড় যেন হুমড়ি খেয়ে মঞ্চ ভেঙে ফেলবে। বাহারি পাঞ্জাবি আর চমৎকার শাড়ি পরে উপস্থাপক-উপস্থাপিকা সমানে শুদ্ধ বাংলা, ইংরেজি আর সিলেটি ভাষায় দর্শকদের মঞ্চ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার জন্য অনুরোধ করছেন, আর বলছেন, তা না হলে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য করা হবে। ইঙ্গিতে আশপাশের পুলিশ আর মাথার ওপরের হেলিকপ্টার দেখাচ্ছেন। কে শোনে কার কথা? অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও রয়েছে প্রধান আকর্ষণ বাংলাদেশ থেকে আগত কুমার বিশ্বজিৎ আর মেহ্‌রীন। ওদের দুচোখ ভরে দেখবে, ওদের কথা শুনবে, কণ্ঠের গান শুনবে তারপর বাড়ি যাবে। এতো পেছনে যাওয়াযাওয়ি কিসের?

পুরো এলাকা জুড়ে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। বিশাল জনসমাগম, কোথাও সামান্য অব্যবস্থার চিহ্ন নেই। দারুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মাথার ওপর ক্লান্তিহীন চক্কর দিচ্ছে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের হেলিকপ্টার। একটানা ভিডিও হচ্ছে। গোটা এলাকা জুড়ে ঠায় দাঁড়ানো হাজার হাজার পুলিশ, আরো আছে অন্যান্য সিকিউরিটি সার্ভিসের লোকজন নিরাপত্তা আর পাবলিক সার্ভিস নিশ্চিত করার জন্যে। যেকোনো সমস্যায় নির্দ্বিধায় পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। বাচ্চার হিসি পেয়েছে? ন্যাপি চেঞ্জ করবেন? নিজেকে নিরুপায় ভাবার কোনো কারণ নেই, পুলিশ বলে দেবে সবচেয়ে কাছের টয়লেট বা চেঞ্জরুম কোথায়। এছাড়ও বসানো হয়েছে অতিরিক্ত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এবারের মেলায় গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি লোকসমাগম হয়েছে। গত বছরও বৈরী আবহাওয়ার কারণে যারা মেলা মিস করেছেন, মেঘলা আকাশ আর থেমে থেমে বৃষ্টি তাদের উৎসাহে এতোটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। সারা দিন ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া আর ধুমসে আড্ডা। তৃতীয় বাংলার এই মহামিলন শেষে আগামী বছরে আবার এক হবার এক বুক আশা নিয়ে বিকেলে সবাই একে একে বাড়ি ফিরেছেন।

আফলাতুন হায়দার চৌধুরী
লন্ডন

বা ি র্মি ি ং ি হা ি ম

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর

গণসংবর্ধনা

গত ১৮ এপ্রিল বর্মিংহামের মাল্টিপারপাস সেন্টারে বার্মিংহাম বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর সম্মানে এক নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহামস্থ বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার আশরাফ উদ্দিন, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রদূত তোজাম্মেল টনি হক ওবিই। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আশা ব্যক্ত করেন যে, নবনিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার তার কার্যকালীন মেয়াদে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ব্রিটেনের বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ ব্রিটেন-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। প্রধান অতিথি আনোয়ার চৌধুরী তার বক্তব্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূয়সী প্রশংসা করে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বাংলাদেশ একটি প্রবল সম্ভাবনাময় দেশ এবং বাংলাদেশ তার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে মালয়েশিয়ার মতো উন্নতি সাধন করতে পারে। তিনি বলেন যে, ব্রিটেনেও বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মরা আজ অন্যান্য কমিউনিটির চাইতে পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশী নতুন প্রজন্মের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন বক্তার দাবির প্রেক্ষিতে তিনি সকলকেই আশ্বাস দেন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বাংলাদেশে তাদের অবস্থানকালীন যাতে কোনো প্রকার হয়রানি বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন তার ব্যবস্থা নেবেন এবং সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা হাই কমিশনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করবেন।

Md. Abdul Latif, Park Grove, Small Heath, Birmingham, U. K
abdul-latif-Ol@yahoo.com

জা ি পা ি ন

সাংবাদিক-লেখক ফোরামের নির্বাচন

গত ৪ এপ্রিল টোকিওর শিবুইয়ায় বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বে সভাপতি কাজী ইনসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বাকের মাহমুদের উপস্থাপনায় বিগত বছরের ফোরামের কার্যক্রম তথা সাফল্য ব্যর্থতা ও হিসাব-বিকাশের খতিয়ান উপস্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে পূর্বতন কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এনএইচকে'র বাংলা বিভাগের সাংবাদিক আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্বে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়। গোপন ব্যালটের এই নির্বাচনে সভাপতি পদে বদরুল বোরহান, সাধারণ সম্পাদক পদে সজল বড়ুয়া নির্বাচিত হন। প্রচার সম্পাদক হিসেবে হাবীবুল হক শাহীন মৌখিক সমর্থনে নির্বাচিত হন। এছাড়া উপদেষ্টা হিসেবে এনএইচকে'র বাংলা বিভাগের সাংবাদিক ও প্রথম আলোর টোকিও প্রতিনিধি মঞ্জুরুল হক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আরিফ মাসুদ ববিকে সর্বসম্মতিক্রমে পুনঃনির্বাচিত করা হয়।

বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, টোকিও, জাপান

দ: া কো া রি া য়া

হরেক রকম স্বপ্ন জাগে

আমাদের দাদার আমলে নাকি শোয়ার ঘর আর গোয়ালঘর প্রায় একসঙ্গে নির্মাণ করা হতো? তাই বলে আমরা তো তেমনটি করতে পারি না। কেননা, পৃথিবী অনেক বদলে গেছে, বদলে গেছে তার বেশভূষা।

যে কথা বলছিলাম- বসন্ত বিকেলে আপন মনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। রাস্তার দু'পাশে হরেক রকম ফুলে সজ্জিত দেখে মনটা প্রফুল্ল হওয়ার বদলে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো। কারণ এখানে প্রতি বছর প্রধান প্রধান শহরগুলোতে সরকারি উদ্যোগে রাস্তার দু'পাশে বিভিন্ন ফুলের চাষ করা হয়। দেখলে পুরো শহরটাই একটা বাগান মনে হয়। আর আমাদের দেশের রাস্তার দু'পাশ সজ্জিত থাকে ফুটপাতে। প্রতি বছর ওটা ভাঙা আবার মেরামত।

রাস্তার বাগানে বন্ধুর সাথে ডানে আমি

হাঁটতে হাঁটতে একটা গোলাপ ফুল ছিড়ে সৌরভ নেয়ার চেষ্টা করলাম, মনে হলো এটা যেন একটা কাগজের ফুল। কারণ ঐ গোলাপে আমাদের দেশের গোলাপের মতো সেই মনমাতানো সৌরভ নেই। তখন ভাবলাম, প্রকৃতি আমাদের সব উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের লালন করার সাধ্য থেকে বিধাতা আমাদের বঞ্চিত করেছে। এখন বিধাতাকে দোষারোপ করা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। কেননা, আমরা ১১ জন বাংলাদেশী একটি কোম্পানিতে অক্লান্ত শ্রম আর মেধা দিয়ে এ দেশের মালিকদের কোটি কোটি টাকার ভান্ডার গড়ে দিচ্ছি। শুধু আমরা ১১জনই নয়, এরূপ সব প্রবাসীই তাদের মেধা ও শ্রম ভিনদেশীদের জন্য ব্যয় করছে। কেন আমরা নিজের দেশে আমাদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে পারলাম না? যাই হোক, আমরা হয়তো বা দেশের যোগ্য সন্তান ছিলাম না। বিধাতা চিরকাল আমাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবেন না। একদিন না একদিন আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন। সেদিন যেন আমরা নিজের দেশকে আপন মনে সাজাতে পারি। আমি সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম।

শেখ মিন্টু
4040-220 Inchon Sogo
Soknam- Dong, 223-658 Daesung.
S.Co, South Korea
Email : Sk-minto@yahoo. Com

গ্রি া স

একটি ছাগলের জন্য

একদিন গ্রিক টিভিতে দেখলাম একটি ছাগল ঘাস খেতে খেতে পাহাড়ের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেল। ছাগলটি আর কিছুতেই পেছনে ফিরে আসতে পারছে না। ফায়ার সার্ভিসের লোকদের খবর দেয়া হলো। ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এসে ছাগলটিকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলো। বাংলাদেশের যে ফায়ার সার্ভিস বিভাগটি জনগণের অর্থ দ্বারা পরিচালিত, জনগণের টাকা খেয়ে-পরে যে বিভাগের লোকগুলো প্রতিদিন বড় হচ্ছে ও সম্পদশালী হচ্ছে, এদের কি জনগণের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই? ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রশ্ন- এই তিন-চার হাজার মানুষের জীবনের মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চেয়ে কত কম? বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল, ভবিষ্যতে এই বিভাগে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাচাই করে বুদ্ধিদীপ্ত, তারুণ্যসম্পন্ন মেধাবী নওজোয়ানদের নিয়োগ দিতে। ঘুষ খেয়ে, স্বজনপ্রীতি করে ভেজা বেড়ালদের নিয়োগ দেবেন না। জাতিকে আর পদদলিত করবেন না।

Khalilur Rahman, Kyras- Vrysi, st. Alex, Papanastasiou, Istmia-20100, House No-95, Korin Thos, Greece

প া র্তু া গা া ল

শুভ জন্মদিন সাদিক

২৬ এপ্রিল ২০০৪-এ সাদিকের প্রথম জন্মদিন। জন্মের পর থেকে দেখার সুযোগ না হলেও স্বপ্নে প্রায়শই তার সঙ্গে খেলা করি, কথা বলি, বুকে নিয়ে জড়িয়ে ধরি। তাকে না দেখার কষ্টটুকু যে কত তা কিভাবে লিখবো, এটা হয়তো ভাগ্য। স্বজনেরা হয়তো অনেক কথাই বলছে, কেন দেখতে আসছে না? সত্য এটাই যে, যখন দেশে আসার বৈধ কাগজ ছিল তখন অর্থনৈতিকভাবে ছিলাম আমি নিতান্তই দুর্বল। আজ যখন টিকেটের পয়সা জোগাড় করলাম আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। ভিসা নবায়ন করতে দিলাম ১৬ মার্চ ২০০৪-এ। অফিসার তারিখ দিয়ে দিল। নবায়নের তারিখ ২৬ এপ্রিল ২০০৪। দুঃখে শুধু হাসলাম। অফিসার সাহেব ৫-১০ দিন আগেও বা কেন দিল না। সে দিনই নবায়নের তারিখ রশিদের মধ্যে লিখে দিল যে দিন আমার একমাত্র সন্তানের প্রথম জন্মদিন। পাঠকমন্ডলী, উপরের কথাগুলো লিখতে কষ্ট হয়েছে, হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন কার কথা লিখছি, ২৬ এপ্রিল ২০০৪ আমার ছেলে নুরুস সাদিক মজুমদারের প্রথম জন্মদিন। ভেবেছিলাম ভিসা নবায়ন হয়ে গেলে নির্দিষ্ট তারিখের আগেই বাংলাদেশে পৌঁছে যাব। তাই আজ এ লেখার মাধ্যমেই তার শুভ জন্মদিন এবং দোয়া করি যা কি না একজন বাবা যতটুকু দোয়া তার ছেলের জন্যে করে থাকেন। শুধু তাই নয়, ২৬ এপ্রিল যত ছেলে-মেয়ে অবালবৃদ্ধবনিতার জন্মদিন, তাদের সবার জন্যেই আমার দোয়া, শুভেচ্ছা ও সালাম রইল।

Nurul Amin MaJumder, Rua Dos Cavalieros-55, 1100-132 Lisboa, Portugal
00351933183344